নবীজীর আদর্শ ও আমাদের জীবন বাস্তবতা

মূল: দা'য়ী-এ ইসলাম
হযরত মাওলানা কালীম সিদ্দিকী
খলিফা, সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী (র.)
পরিচালক: জমিয়তে শাহ ওয়ালিউল্লাহ, মুজাফফরনগর, ইউ,পি

অনুবাদ
মুফতি যুবায়ের আহমদ
পরিচালক: ইসলামী দাওয়াহ ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ
মান্ডা শেষ মাথা, মুগদা, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১

হিলফুল ফুযুল প্রকাশনী
১৩৫/৩, উত্তর মুগদাপাড়া, ঢাকা-১২১৪
০১৯১৭ ৫৯৭ ৫৫১, ০১৯৭৮ ১২৭ ৮০১
www.jubaerahmad.com

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট-২০১২ ই.

নবীজীর আদর্শ ও আমাদের জীবন বাস্তবতা
প্রকাশক. আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার তালাত মুহাম্মদ তৌফিকে এলাহী
স্বত্ব. সংরক্ষিত,
প্রচ্ছদ. নাজমুল হায়দার, **কম্পোজ.** যুবায়ের আহমদ, **প্রাপ্তিস্থান.** ইসলামী দাওয়াহ্ ইনস্টিটিউট মুগদগা, মান্ডা, ঢাকা মাকতাবাতুল কুরআন ১১/১ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, হক লাইব্রেরী, ১৮ আদর্শ পুস্তক বিপণী বাইতুল মোকাররম, ঢাকা ১০০০, মুহাম্মাদী কুতুবখানা ১০৩, বড় মসজিদ মার্কেট, ময়মনসিংহ

সুভেচ্ছা মূল্য. ৩০ টাকা মাত্র

প্রকাশকের কথা

আমার মালিকের অপার রহমত, বরকত ও মাগফেরাতের আশায় 'নবীজীর আদর্শ ও আমাদের জীবন বইটি প্রকাশের উদ্যোগী হয়েছি।

হৃদয়ের গভীরতম কোণ থেকে একটি ক্ষীণ আশাই উৎসারিত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, যদি আল্লাহর কোনো বান্দা বইটি পাঠ করে ইসলামের পথে উৎসাহিত হয় এবং অন্যদের দাওয়াত দেওয়ার মাধ্যম হয়, সেই উসিলায় আল্লাহ যদি আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দান করেন। সেই সাথে প্রবল প্রত্যাশা, এই কাজে সহযোগীসহ সকল পাঠক-পাঠিকাকেও যেন মেহেরবান মালিক কবুল করেন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট আমার একান্ত অনুরোধ রইল, আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুদ্রণগত যেসব ভুলত্রুটি রয়ে গেছে সেজন্য আমি অনুতপ্ত। আমার এই অপরাধ মার্জনাযোগ্য মনে করে এই বইটির ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করলে আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ থাকবো। সম্মানিত পাঠক-পাঠিকার জন্য আমার মালিকের নিকট এই প্রার্থনাই রইলো, তিনি যেন তাঁদের সাথে আমাকে ও অনুবাদককে তাঁর ক্ষমারযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করেন।

তালাত মোহাম্মাদ তৌফিকে এলাহী
০৫-০৪-২০১২ ঈসায়ী

অনুবাদকের কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার, যিনি কোনো আবেদন ছাড়াই আমাদেরকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মত বানিয়েছেন। দরুদ ও সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালীন, খাতামুন নাবীয়্যিন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবা (রা.) এর ওপর।

২০০৩ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে ঘুরতে গিয়েছিলাম ঐতিহ্যবাহী গ্রাম ফুলাতে। সেখানেই প্রথম পরিচয় হয় হযরত মাওলানা কালিম সিদ্দিকী সাহেব (দা. বা.) এর সাথে। তাঁর সুন্দর আচরণে আমি খুবই প্রভাবিত হই এবং তার সাথে এসলাহী সম্পর্ক করতে সিদ্ধান্ত নিই। তিনি নিজ হাতে আমাদের মেহমানদারী করলেন; সুন্দর সুন্দর কথা বললেন। বিদায় পর্বে আমাদের প্রত্যেককে কিছু বই হাদিয়া দেন; সেই বইগুলোর মধ্যে বর্তমান বই (উসওয়ায়ে নবীয়ে রহমত) টিও ছিল। বইটি পরে খুবই উপকৃত হলাম। ইচ্ছা জাগলো এই কথাগুলো আমার দেশের মানুষেরও জানা উচিৎ। কয়েকজন বন্ধুকে এ বইটি অনুবাদ করতে বললাম, কিন্তু তারা আগ্রহ প্রকাশ করলো না। পরিশেষে নিজেই তা অনুবাদ করার ইচ্ছা করলাম। কিন্তু ইচ্ছা করলে কী হবে, আমি তো অনুবাদ ময়দানে শাহ সওয়ার নই। এই ময়দানের শিশু শ্রেণীর ছাত্র। যাক, আল্লাহর ওপর ভরসা করে অনুবাদ করা শুরু করলাম। আল্‌হামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তা সমাপ্ত করারও তাওফীক দিলেন। হযরতের লিখা যখনই অনুবাদ করতে বসি তখনই এ দ্বারা আমি রূহানী খোরাক পাই।

এই পুস্তিকাটি প্রকাশে বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। তার মধ্যে কয়েক জনের নাম না নিয়েই পারছি না। বইটি প্রুফ দেখে সহযোগিতা করেছেন আমার বন্ধুবর মাও.এমদাদুল হক তাসনিম ও মাওলানা মিজানর রহমান সাহেব; আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন। বইটি প্রকাশ করলেন জনাব আলহাজ তালাত মোহাম্মদ তৌফিকে এলাহী, সহযেগাগিতা করেছেন আলহাজ এ.কে.এম ফজলুল করিম ও আলহাজ নাসির সাহেব। সকলকে আল্লাহপাক দীনের খাদেম হিসাবে কবুল করুন।

আমি শুরুতেই বলেছি লেখা লেখির ময়দানে আমি শিশু শ্রেনীর ছাত্র। আমরা চেষ্টা করেছি এরপরও যদি কোনো ভাই বোনের চোখে ভুলত্রুটি দৃষ্টিপাত হয়, তাহলে জানালে খুশি হবো এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ঠিক করে দেয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

যুবায়ের আহমদ
ইসলামী দাওয়া ইনস্টিটিউট
১৩,০৬,১২ঈ.

মুখবন্ধ

মাওলানা ডা. মুহসিন উসমানী নদভী

মাওলানা কালীম সিদ্দিকীর ব্যক্তিত্ব আপাদমস্তক একটি আন্দোলন ও আমল। তিনি যখন লিখনির ময়দানে পা বাড়ান, তখন কলমের মাধ্যমে অন্যকেও কর্মতৎপতার ও আমলের পয়গাম দেন। তার এই রচনা "উসওয়ায়ে নবীয়ে রহমত" (নবীজির আদর্শ ও আমাদের জীবন বাস্তবতা); চেতনার পয়গামাও বটে। এর মধ্যে রয়েছে পবিত্র সীরাত অধ্যায়নের নতুন পদ্ধতি ও অভিনব উপস্থাপনা এবং নিজেকে পুরোপুরিভাবে নববী আদর্শে আদর্শিত করার শিক্ষা।

পবিত্র সীরাতের ওপর প্রত্যেক যুগে অসংখ্য বই লিখা হয়েছে। এমনকি উর্দু ভাষায়ও এমন কিছু বই আছে যা বিশ্বকোষের মর্যাদা রাখে। এই বইগুলোতে জ্ঞান ও তাৎপর্যের রূহ প্রকাশ পেয়েছে। স্বয়ং লেখকগণের বাস্তব অবস্থা হলো দাওয়াত ও জিহাদের ময়দানে তারা কখনও ভ্রমণ করেন না। মনে হয় যেন লেখক সমূদ্রের উপকূলে বসে ঢেউ এর খেলা দেখেন আর সেই তরঙ্গগুলো গননা করে পুস্তক তৈরি করেন। কিন্তু সমুদ্রের উপকূলে বসে ঝড়ের দৃশ্য দেখা এককথা আর নিজে সেই ঝড়ের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হওয়া এবং হায়াতের কিশতিকে বিপদে ফেলানো ভিন্ন কথা। প্রথম কাজটি হলো সৌভাগ্য, আর দ্বিতীয় কাজটি হলো, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য। সীরাতবিদদের জন্য প্রথম কাজটি হলো কলম দ্বারা চিত্রাঙ্কন করা, আর দ্বিতীয় কাজটি হলো সীরাতের পদক্ষেপে চলা। এ কথা সত্য যে, সীরাতের ওপর চলার জন্য রাহবারী ও দিকনির্দেশনা সীরাতের চিত্রাঙ্কন কারীদের থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু ওই মানুষকে কী বলা যায় যারা পথের আলো চায়, কিন্তু পথ ও গন্তব্য চায় না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এত্তেবার দাওয়াত তো অনেক হচ্ছে। কিন্তু আফসুস ও আশ্চর্যের কথা হলো, পবিত্র সীরাত বরং সমস্ত নবীদের

সীরাতের মধ্যে যেই সুন্নতটি সুস্পষ্ট তা থেকে মানুষ উদাসীন। এর মধ্যেও মানুষ তার ভুলকে অনুভব করতে পারে না। এই যুগে যে সুন্নতে নববীর সবচে বেশি দাওয়াতদানকারী সে সবচেয়ে বড়সুন্নতকে বেশি করে ছেড়ে দিচ্ছে। আল্লাহর বান্দার কাছে ঈমানহীন লোকদের নিকট ঈমানের সওগাত পৌঁছিয়ে দেয়া সকল নবীদের বড় সুন্নত। কিন্তু মুসলমানদের এসলাহ- আত্মশুদ্ধির কাজকে দাওয়াতের শিরোনাম দেয়া হয়েছে। এসলাহ ও দাওয়াত ছিল আম্বিয়া (আ.) এর দাওয়াতের একটি শাখাগত দিক। জমিনে বসবাসকারী মানুষকে জাহান্নামের বিপদ থেকে সতর্ক করা হলো দাওয়াতের ব্যাপক কাজ। এখানে এ কারণ দর্শালে চলবে না যে, প্রথমে নিজের ঘর ঠিক করি এবং মুসলমানকে ভালো মুসলমান বানাই। আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে প্রত্যেক স্থানে মুসলমানদের এমন অনেক লোক পাওয়া যাবে, যারা নিজের আমল-আখলাক, খোদাভীতি এবং আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক এসব দিক থেকে খুব ভালো মুসলমান। কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে দাওয়াতের সুন্নত থেকে এতো দূরে সরে গেছে যে, মুসলমান, মুত্তাকি এবং পরহেজগার লোকও এ কাজের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তাদের এ ব্যাপারে কোনো চিন্তাও হয় না। খেয়ালও হয় না যে, দৈনন্দিন জীবনের ছোট ছোট সুন্নতের দাওয়াত দিচ্ছি তো ঠিক, কিন্তু সবচে বড় সুন্নত ত্যাগকারী হচ্ছি। একথা বাস্তব যে, মাওলানা কালীম সিদ্দিকী দা.বা. এর এই মিশন অনেক সংঘঠনের কাজ থেকে ফলপ্রসূ, প্রশস্ত ও আলোকপ্রদ।

উসমান নদভী

নদওয়াতুল উলামা লাক্ষ্ণৌ

ভূমিকা

১৯৯৫ সনে নভেম্বর মাসে এই অধম হারদুইতে মহিউসসুন্নাহ শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। হযরত আসরের পর চা পানের জন্য তাঁর বাসায় ডাকলেন। সেখানে অনেক ওলামায়ে কেরামের উপস্থিত ছিলেন। হায়দারাবাদের কিছু বড় বড় ওলামায়ে কেরামও এসেছিলেন। চা পানের সময় হযরত মাওলানা (রহ.) বললেন, 'মাদরাসার ছাত্র-উস্তাদগণের উপকারার্থে আগত মেহমান ওলামায়ে কেরাম দ্বারা আলোচনা করানো হয়। ভালো হলো আজকেও নামাযের শেষে মাওলানা কিছু কথা রাখবেন। আমাকে তো একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ডাক্তার কথা বলতে নিষেধ করেছেন। শহরে আমার একটি প্রোগ্রামও আছে, আগে থেকে ওয়াদা করে রেখেছি, সেখানে যেতে হবে। এস্তেফাদার জন্য আমিও কোনো একটি সুযোগ করে নিব।'

হযরতের সম্বোধনে আমি ধারণা করেছিলাম যে, ওই বড় ওলামাদের কাউকে হয়তো বলছেন। এই অধমও সমর্থন দিল যে, জী হযরত! এটা হতে পারে। আমিও এতে আগ্রহী। চা পানের পর বাইরে চলে এলাম। হারদুই হযরত (রহ.)-এর এক খাদেম (সাইয়েদ কালীম হাসান সাহেব) এসে ফুলাতের কালীম সিদ্দিকী সাহেব বলে ডাক দিলেন। নায়েব সাহেব (মাওলানা বাশারত আলী রহ.) মজলিসে মালফুজাত পড়ে শুনাচ্ছিলেন। তিনি থেমে গেলেন এবং ভাবলেন –মনে হয় তাকে হযরত কিছু বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কালীম হাসান সাহেব আমাকে বললেন, আপনি কখন আলোচনা করবেন, হযরত তা জানতে চেয়েছেন। এই অধম বিচলিত হয়ে গেল। এক মহান মুসলেহ-এর দরবারে এই এক অধম কিভাবে বয়ান করার সাহস করতে পারে। আমি আবেদন করলাম, আমি কিভাবে বয়ান পেশ করব, আমি তো ভাবছিলাম, অন্য কোনো আলেমকে হযরত হুকুম করেছেন। কালীম হাসান সাহেব বললেন, হযরত আপনাকেই হুকুম করেছেন। এই অধম হুকুম অমান্য করার হিম্মত না করতে পেরে আবেদন করল যে, হযরতের হুকুম তো মানতেই হবে তাহলে হযরত যখনই হুকুম করবেন, আমি আমার সবক শুনিয়ে দেব। তিনি হযরতের কাছে গেলন এবং ফিরে এসে বললেন, হযরত (রহ.) বলেছেন, এশার পর সবচাইতে উপযুক্ত সময়। এক দেড় ঘণ্টা যতক্ষণ চান বয়ান করতে পারবেন।

এই অধমের ওপর আতঙ্কের এক অবস্থা কাজ করছিল, কোনো বিষয়ই জেহেনে আসতে ছিল না। এশার পর পর্যন্ত জেহেন ছিল অপ্রস্তুত।

ছাত্র ও উস্তাদগণ মসজিদে একত্রিত হলেন। ৪টি টেপরেকর্ট সামনে রেখে দেয়া হলো। এক শিক্ষক বললেন, আমাদের উস্তাদদের উস্তাদ, শাইখুল কুররা (এই মুহূর্তে তাঁর নাম মনে আসছে না) এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি যদি কিছু তেলায়াত করেন তো ভালো হবে। এই অধম খুশির সাথে আবেদন করল, অবশ্যই হতে পারে। মনে এই খেয়াল সৃষ্টি হলো যে, কুরআনের আয়াতের বরকতে হয়তো কোনো বিষয় মনে হয়ে যাবে। কারী সাহেব তেলাওয়াতের আদব বর্ণনার পর তেলাওয়াত শুরু করলেন, তেলাওয়াদের মধ্যে মুশাব্বা লেগে গেল, ছোট ছোট কচি কাঁচা বাচ্চারা, কারী সাহেবের তেলাওয়াত ঠিক করে নেয়ার জন্য নিঃসঙ্কোচে (লুকমা) সুধরিয়ে দিতে লাগলো। কারী সাহেব তেলাওয়াত পূর্ণ করলেন এবং ছাত্রদের ধন্যবাদ জনালেন। পরবর্তীতে জানতে পারলাম ওই টেপ রেকর্ট হযরত মহিউস্‌সুন্নাহ (রহ.) রাখিয়েছিলেন। যাতে আলোচনাটি সংরক্ষিত থাকে। পরে হযরত আমার সবকটি দ্বিতীয় বার শুনেছেন এবং খুব পছন্দও করেছেন।

এর কিছুদিন পর মিরাটের এক সফরে কোনো এক সুযোগে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। পথেই খুব স্নেহের সাথে বলতে লাগলেন যে, কালীম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সাক্ষাতের পর সেই সবকটির ওপর খুব সমর্থন দিলেন এবং উৎসাহ দিলেন। হযরতের এই সমর্থনের পর হযরত মহিউসসুন্নাহ (রহ.)-র খাস ফয়জ মনে করে এই বয়ানটিকে "উসওয়ায়ে নবীয়ে রাহমত আওর হামারে যিন্দিগী"(নবীজীর আদর্শ ও আমাদের জীবন বাস্তবতা) নামে প্রকাশ করা হলো। যার মধ্যে মাওলানা উসমান সাহেবের একটি অভিমতও পেশ করা হয়েছে। পরবর্তীতে বহুবার ছাপানোর পর কম্পোজ গত কিছু সমস্যা ও নিজের উদাসীনতার কারণে বিষয়টির বহু স্থানে অস্পষ্ট রয়ে গেল, যা বোঝার উপযুক্ত রইল না। তাই দ্বিতীয় বার দেখে প্রয়োজন মতো কিছু স্থানে পরিবর্তন পরিবর্ধন করে পাঠকদের সমীপে পেশ করা হলো, আল্লাহ তাআলা এই সবকটিকে এই অধম ও পাঠকদের জন্য সীরাতের মুতালার হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমিন

মুহাম্মদ কালীম সিদ্দিকী

জমিয়তে শাহ ওলিউল্লাহ ফুলাত, মুজাফফরনগর।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العامين , و الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى اله و صحبه اجمعين , ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين , اما بعد قال الله تعلى : اعوذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم "لقد كان لكم فى رسول الله وسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ذكر الله كثيرا" (الاحزاب)

প্রজ্ঞাময় মালিক, বিশ্বজগতের স্রষ্টা, মহান আল্লাহ মানুষকে এ ধরায় তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দয়া এ দুনিয়ায় মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন। সাথে সাথে তাঁর বান্দাদের পথ-প্রদর্শনের জন্য ধারাবাহিকভাবে নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন। মানুষের হেদায়াতের জন্য নবী ও রাসূলদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর পক্ষ থেকে কিতাব ও সহীফা দান করেছেন। পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানুষ হলেন হযরত আদম (আ.)। তিনিই ছিলেন প্রথম রাসূল। তাঁর পরে ধারাবাহিকভাবে বহু নবী আগমন করেছেন। কখনো আবার একই যুগে বিভিন্ন স্থান ও গোত্রে একাধিক নবী-রাসূলদের আবির্ভাব ঘটেছে। হযরত আদম (আ.) থেকে নিয়ে সাইয়েদিনা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ পর্যন্ত কম-বেশি সোয়া লক্ষ রাসূল দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। এর সমাপ্তি ঘটল সর্বশেষ নবী খাতামুন্নাবীয়্যিন হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর মাধ্যমে।

আমাদের নবী ﷺ-এর পূর্বে যত নবী-রাসূল এসেছিলেন, তাঁদের নবুওয়াত ও আবির্ভাব ছিল সাময়িক এবং নির্দিষ্ট স্থানের জন্য। কাউকে পাঠানো হয়েছিল কোনো জাতির জন্য, আবার কাউকে পাঠানো হয়েছিল কোনো অঞ্চল ও যুগের জন্য। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী ﷺ কে কেয়ামত পর্যন্ত বিশ্বের সকল মানুষের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠানো হয়েছে। তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ তাআলার চিরস্থায়ী বাণী, সর্বশেষ বার্তা, মহাপবিত্র গ্রন্থ 'আল-কুরআন'। পূর্ববর্তী নবীদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব ও সহীফাসমূহের সংরক্ষণের দায়িত্ব ছিল সেই কিতাব বহনকারী অনুসারীদের ওপর; যার হক তারা আদায় করতে পারেনি। বরং সেই আসমানি কিতাব ও সহীফাসমূহ বিকৃতির স্বীকার হয়েছে। এর

বিপরীত কেয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ধর্ম ইসলামকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য, কুরআন মাজিদের সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তাআলা নিজেই নিয়েছেন। তিনি বড় শান-শওকতের সাথে ঘোষণা দিয়েছেন إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُون অর্থ : আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই উহার সংরক্ষক।

-সূরা হিজর: ৯

কুরআন শরীফের অর্থ ও ভাষ্যকে বুঝা ও আমল করার জন্য আমাদের প্রিয়নবী ﷺ কে কুরআনে কারীমের পূর্ণ আমলি নমুনা বানিয়ে পাঠিয়েছেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর প্রসিদ্ধ বাণী, যা হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়, তাঁকে একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সীরাত ও আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা কি কুরআন পড় না? প্রশ্নকারী ইতিবাচক উত্তর দিলে তিনি বললেন, كان خلقه القران তাঁর আখলাক ছিল 'আল কুরআন'। অর্থাৎ কুরআনে কারীম হলো রাসূল ﷺ-এর পবিত্র জীবনচরিতের সংরক্ষিত ও লিখিত নমুনা। আর তাঁর জীবনী হলো কুরআন মাজিদের সংরক্ষিত আমলী রূপরেখা। মোটকথা, কেউ যদি কুরআনের আমলী রূপ দেখতে চায়, তাহলে সে যেন সীরাতে রাসূলের প্রতি দৃষ্টি রাখে। আর যদি পবিত্র সীরাতকে দেখতে চায়, তাহলে যেন কুরআন শরীফ অধ্যয়ন করে। এই ধর্ম অবিকৃত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। এর স্ব-অবস্থায় সংরক্ষণ রাখবেন আল্লাহ তাআলা নিজেই এবং তাকে বাঁচিয়ে রাখবেন পরিবর্তন-পরিবর্ধনের ছবল থেকে। আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদের হেফাজতের জন্য অলৌকিক ব্যবস্থা করেছেন। আজ চৌদ্দশত বছর পরও কুরআন মাজিদ এক একটি অক্ষর, যের-যবর ও নক্তাসহ তাঁর মূল অবস্থায় সংরক্ষিত আছে।

শুধু লিখিত ও প্রকাশিতভাবেই নয়, বরং লক্ষ কোটি মানুষের অন্তরে তাজবীদের সাথে তার শব্দ ও পড়ার নিয়ম-কানুন এমনভাবে সংরক্ষণ করেছেন যে, কোথাও যদি একটি যের-যবর, নুক্তাও ভুল লেখা হয় বা ছাড় পড়ে যায়, তাহলে পুরো দুনিয়ার মুসলমানগণ হুংকার দিয়ে গর্জে উঠবে। অথবা কোনো কারী সাহেব কোথাও একটি যের-যবরও যদি ভুল পড়ে ফেলেন, তাহলে মজলিসে অবস্থানরত ছোট শিশু হাফেজরাও তাকে শুদ্ধরূপে পড়তে বাধ্য করবে। তদ্রূপ কুরআন

মাজিদের আমলি নমুনা হলো পবিত্র সীরাত। আর তা সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ পাক খুবই সুন্দর ও পবিত্র ব্যবস্থা করেছেন। সাহাবায়ে কেরামের মতো যোগ্যতাসম্পন্ন একটি জামাত কে রাসূল ﷺ এর সঙ্গী হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এর থেকে উত্তম জামাত পূর্বের কোনো নবী বা রাসূলদের দেয়া হয়নি। সাহাবাদের এই জামাত পবিত্র সীরাতের এক একটি অংশ এবং তার ছোট বড় প্রতিটি কাজ আমাদের পর্যন্ত এমন সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করে পৌঁছিয়েছেন, যা আজকাল কম্পিউটার ও ভিডিও গ্রাফিক্সের যুগেও পরিপূর্ণভাবে সুন্দর পদ্ধতিতে কারো জীবনী সংরক্ষণ করা অসম্ভব। নোখ কিভাবে কাটতেন, খানা খেয়ে আঙ্গুল কিভাবে চাটতেন, মৃদু হাসতেন তো হাসার ধরন কেমন ছিল। চেহারা মুবারকে চিন্তার প্রভাব থাকলে কেমন দেখা যেত, চলার সময় কিভাবে চলতেন, ইত্যাদি।

মোটকথা, তাঁর জীবনী সংরক্ষণ করা হয়েছে, পূত-পবিত্র ও সুন্দর মাধ্যমে। আমরা যখন পবিত্র সীরাত অধ্যয়ন করি, তখন আমদের সামনে রাসূল ﷺ-এর পবিত্র সত্ত্বা ভেসে ওঠে। তাঁর বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ আখলাক-চরিত্র, চলা-ফেরার সবকিছু অনুভব হয়। আমাদের জীবনকে যদি রাসূলের পবিত্র আদর্শের কাঠামোতে ঢেলে সাজাতে চাই, তাহলে ন্যূনতম কোনো সমস্যাও হবে না। সীরাতের নমুনা বোঝে আমলকারী সাহাবাদের জামাতকে সত্যের মাপকাঠি বলে কুরআন নিজেই ঘোষণা দিয়েছে। এই পবিত্র ধর্মকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য একটি ব্যবস্থা করেছেন। উম্মতকে উপদেশ দেয়ার জন্য, তাঁর নবীর মাধ্যমে বিদায় হজ্বে একটি ভাষণ দেওয়ায়ে ছিলেন। সেখানে নিম্নেবর্ণিত শব্দগুলো মৌলিকভাবে উচ্চারণ করেছিলেন,

تركت فيكم امرين لن تضلوا ماتمسكتم بهما كتاب الله وسنتي

আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত এই দুটিকে শক্তকরে আঁকড়ে ধরবে, ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব, অপরটি হলো আমার সুন্নাত।

কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারীদের জন্য মূলনীতি ও নিয়ম অনুযায়ী দুটি জিনিস দুনিয়াতে রাখা হয়েছে। একটি হলো কুরআন মাজিদ, আর অপরটি হলো তাঁর আমলি নমুনা বা রাসূল ﷺ-এর সুন্নাত। আল্লাহ তাআলা কালামে পাকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন:

لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

অর্থ: রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন এলাকায় এবং বিভিন্ন যুগে দীনদার, মুত্তাকী, পরহেজগার, আল্লাহওয়ালা, খাঁটি মুমিন, আল্লামা, ফাহ্হামা, গাউছ, কুতুব, হযরতজী, পীর সাহেব ও তাবলিগ ওয়ালা হওয়ার জন্য অন্য কোনো মাপকাঠি থাকলে থাকতে পারে। কিন্তু আখেরাত তথা কেয়ামত দিবসে আমার সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং আমাকে স্বরণ রেখে জীবনযাপনের জন্য শুধুমাত্র আমার রাসূল ﷺ এর জীবনই হলো উত্তম আদর্শ।

উসওয়া বা আদর্শ, নমুনা ও আইডিয়াল–এগুলো খুবই সংবেদনশীল শব্দ। কোনো আর্টিকার যদি কাগজে একশ তলার একটি বিল্ডিং-এর নমুনা আঁকে, তাহলে দেখতে হুবহু একশ তলা বিশিষ্ট একটি বিল্ডিং মনে হবে। কিন্তু কেউ যদি সেখানে টয়লেটের প্রয়োজন মিটাতে চায়, তাহলে তা হবে অসম্ভব। শুধু দূর থেকে দেখতেই মনে হবে একশ তলা একটি বিল্ডিং; এটা হলো নমুনা। উসওয়া কিন্তু এমনটি নয়। উসওয়ার মধ্যে সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও সমান থাকা জরুরি। প্রতিটি জিনিসের লম্বা, দৈর্ঘ্য, চৌরা, রং, উজ্জ্বলতা, তুলনামূলকভাবে পরিপূর্ণ ও সমান হওয়া জরুরি। নবী করিম ﷺ-এর পবিত্র জীবনীকে আদর্শ বানানো তখনই সম্ভব হবে, যখন মানুষ তাঁর জীবনের সকল শাখায় নবী ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। অন্য স্থানে আল্লাহ তাআলা শুধু আনুগত্য ও পদাঙ্কানুসরণকে ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য শর্ত ঘোষণা করেছেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِى يُحْبِبْكُمُ اللهَ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

(العمران-৩১)

অর্থ: বলো, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন।

-আল ইমারান, আয়াত: ৩১

অর্থাৎ এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, কেয়ামত পর্যন্ত যারা আল্লাহকে ভালোবাসতে ও প্রেমিক বানাতে চায়, তাদের জন্য পথ একটিই। আর তা হলো, প্রকাশ্যে ও গোপনে, চাল-চলন, কাজকর্ম, আকিদা-বিশ্বাস,

ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন ইত্যাদি। মোটকথা জীবনের প্রতিটি বিষয়ে নবী ﷺ-এর অনুসরণ করবে। আল্লাহ তাআলা এই মূলনীতি ঠিক করে দিয়েছেন যে, তাঁর রহমতের দৃষ্টি শুধু ওই ব্যক্তির উপরই পড়বে, যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে নবীজীর অনুসরণ ও ইত্তেবা করবে।

কুরআন সুন্নাহকে দীনের ভিত্তি বানিয়ে দীনকে সংরক্ষণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা এই জাতির প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। কেয়ামত পর্যন্ত একদল সংস্কারক, মুসলিহীন, আল্লাহভীরু ওলামাগণের সৃষ্টির নিয়ম রেখেছেন। যারা নিজ এলাকা ও যুগে প্রচলিত দীনকে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে তুলনা করে, দুধ থেকে পানি বেরকরার মতো মিথ্যা থেকে সত্যকে পৃথক করে জাতিকে জানিয়ে দিবেন। ওই ওলামায়ে রাব্বানিয়ীনদের কাজ হবে, কুরআনকে সামনে রেখে ধর্মের মাঝে প্রচলিত কুসংস্কার বা যেখানে কম-বেশি দেখবেন, সে বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করবেন।

এই জাতি কেয়ামত পর্যন্ত পবিত্র দীনকে তার কাঙ্ক্ষিত রূপে মানার জন্য, কুরআন সুন্নার ব্যাপারে যতটুকু সংবেদনশীল হবে, উম্মত সে পরিমাণ গুমরাহী থেকে বেঁচে থাকবে। কুরআনে হাকিমের এক একটি শব্দ ও তার কাঙ্ক্ষিত রূপের মধ্যে এমন সংবেদনশীলতাও রয়েছে যে, আমাদের উস্তাদদের উস্তাদ এবং কারীগণের শায়খও কুরআন পড়তে থাকে, এর মধ্যে যদি একটি যের-যবরও ভুল পড়ে ফেলেন, তাহলে ছোট কচিকাঁচা শিশু বাচ্চারাও যারা ওই শায়খের ছাত্রের ছাত্র, তারা আওয়াজ দিয়ে উঠে যে, হুজুর! আপনার সম্মান আমার শিরোধার্য, কিন্তু কুরআনের একটি শব্দও আপনাকে ভুল পড়তে দেব না। উক্ত শায়খ তাদের এই সংবেদনশীলতা ও সতর্কতাকে কোনো ধরনের বেয়াদবি মনে করবেন না। বরং এটাকে আদব মনে করবেন। শিক্ষক বাচ্চাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে অন্তরে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন এবং বলবেন, আমি আমার ছাত্রদেরকে কুরআনে হাকিমের শব্দ ও বিশুদ্ধ তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে সংবেদনশীল ও চতুর বানাতে সফল হয়েছি। কারণ আমার থেকেও অসতর্কতামূলক একটি ভুল হয়ে গেছে, সেটাও তাদের কছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কুরআনে হাকিমের শব্দের ক্ষেত্রেও জাতির মাঝে যেমন সংবেদনশীলতা, সতর্কতা ও জ্ঞানের গভীরতা পাওয়া যায়। কুরআনে হাকিমের আমলি নমুনা সীরাতে

রাসূলের ক্ষেত্রেও উম্মতের তার চেয়ে বেশি সতর্ক ও সংবেদনশীল হওয়া উচিত।

বড় থেকে বড়, শায়খুল মাশায়খ এবং যুগশ্রেষ্ঠ আলেমকেও যদি সুন্নাতের বিপরীত কোনো আমল করতে দেখা যায়, তাহলে সেটা তার দুর্বলতা ও ভুল মনে করা হবে। এতে ছাত্রের শিষ্যরাও ব্যাকুল হয়ে আওয়াজ তোলবে। তাদের এই উৎসাহকে বেয়াদবির স্থানে সৌকার্য মনে করা হবে।

আফসোস! কুরআনে হাকিমের শব্দের ক্ষেত্রে যথাযথ সংবেদনশীলতা ও সতর্কতা পাওয়া যায়। কিন্তু তার আমলি নমুনা পবিত্র সীরাতের ক্ষেত্রে এমনটি নয়। বরং সত্যকথা হলো এই, আমাদের এখানে কুরআনে হাকিম পড়া-পড়ানোর প্রচলন আছে। চর্চা রয়েছে তাফসিরের সূক্ষ্মবিষয়াবলী ও তার জ্ঞানের জন্য সাস্ত্রীয় বিষয়গুলোর ওপর ব্যাপক পড়া শোনার। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কুরআনে হাকিমের চর্চা রয়েছে। কিন্তু কুরআনে হাকিমকে আমলের দৃষ্টিভঙ্গিতে পড়া-পড়ানোর প্রচলন দুর্লভ। কুরআনকে জিকির বলা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো উপদেশ। যা কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

অর্থাৎ কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। কে আছে উপদেশ গ্রহণ করবে?

-সূরা কামার-১৭

আমরা এ-ও জানি, কেয়ামতের দিন মানুষ চারটি প্রশ্নের উত্তর দেয়া ব্যতীত এক পা সামনে এগুতে পারবে না। তার মধ্যে একটি হলো, তোমার ইলম অনুযায়ী আমল করেছ কতটুকু? এটা সর্বসম্মত মূলনীতি ও খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, যেই ব্যক্তি তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে না, উক্ত ইলম কেয়ামত দিবসে সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নিবে। এমনকি মাওলায়ে কারিমের উপস্থিতিতে আমলের হিসাব চাওয়া হবে। ইল্‌ম অনুযায়ী আমল না করার শাস্তির কথা কুরআন ও হাদীসে বিদ্যমান। যেমন:ইহুদী আলেমদের দোষ বর্ণনা করে কুরআনে বলা হয়েছে:-

مَثَلُ الَّذِيْنَ حَمِّلُوْاالتَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلْ الْحِمارَ يَحْمِلُ اسْفَارَا, بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمُ الَّذِيْنَ كَذِّبُوا باياتِ اللهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْ الظالِمِيْن. (سورةجمعه-৫)

অর্থ: যাহাদিগকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছিল, অতঃপর উহা বহন করে নাই তাহাদিগের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ! কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যাহারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলে। আল্লাহ তাআলা জালিম জাতিকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

-সুরা জুমা-৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

من ازدد علما ولم يزدهدى لم يزددمن الله الابعدا-

অর্থ: যে ব্যক্তি তার ইলেমকে বৃদ্ধি করে এবং হেদায়াতের ক্ষেত্রে বৃদ্ধি হয় না (অর্থাৎ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না) তার সাথে আল্লাহর দূরত্ব বাড়তে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরো ইরশাদ করেন,

يلقى العالم فى النار فتندلق ا قتابه فيدوربها فى النار كمايدور الحمار فى الرحى .

অর্থ: খারাপ আলেমকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ফলে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে। ফেরেশতা তাদেরকে নিয়ে এমনভাবে ঘুরাবে যেমন গাধা পেষণ যন্ত্রের চাকায় ঘোরে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেনঃ

ويل للذى لا يعلم مرة ولوشاء الله لعلمه وويل للذى يعلم ولايعمل ستع مرات.

যে ইলম না জানে, তার উপর ধ্বংস একবার, আল্লাহ তাআলা যদি চান তাহলে তাকে ইলম দিয়ে দিবেন।

আর ওই ব্যাক্তির ওপর ধ্বংস সাতবার, যে ব্যক্তি ইলম শিখে এবং তার ওপর আমল করে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ

اشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه,

অর্থ: কেয়ামত দিবসে সর্বাধিক শাস্তি ওই আলেমের হবে, যাকে আল্লাহ তাআলা তার ইলম থেকে উপকৃত হতে দেননি।

গ্রন্থকার যখন কলেজে পড়াশোনা করত, তখন কিছু বন্ধুদেরকে বলতে শোনা যেত, তারা যে বিষয়ে পড়াশোনা করে নি সে বিষয় সম্পর্কে সমালোচনা করত। তারা অনর্থক সময় নষ্ট করছে এর প্রয়োজনই-বা কি? যেমন–যারা ডাক্তারি বিষয়ে লেখাপড়া করে, তাদের ব্যাপারে বলত, এই 'বাইলোজী' পড়ানোর প্রয়োজনটা-বা কি? এবং অনর্থক ব্যাঙকে ছিড়া- ফাঁড়া করে লাভটা কী? হিসাব শাস্ত্রের একটি বিষয় হলো, 'টেকনমিটরি' যা ইঞ্জিনিয়ারিং-এ প্রয়োজন হয়। তাকে অনর্থক ও অযথা মনে করে। এটা স্বভাবগত বিষয় যে, বাস্তবতার সাথে যে জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক থাকে না, ওই জ্ঞানকে মানুষ অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় মনে করে।

ক্ষমা প্রার্থনা করে আমি আবেদন করছি যে, দীনি কেন্দ্রসমূহের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের কর্মপদ্ধতি থেকে এ কথা প্রকাশ পাচ্ছে এবং আমাদের জীবনও সাক্ষ্য দিচ্ছে যে আমরা কুরআন এবং সীরাতের অধিকাংশ জ্ঞানকে অপ্রয়োজনীয় মনে করি। আমি বাধ্য করছি না যে, আপনি আমার কথায় একমত হোন। তবে আমার আবেদন হলো এতটুকু যে, ওই ব্যক্তি যিনি অল্প হলেও কুরআন ও সীরাতের জ্ঞানের অংশীদার হয়েছেন। আসুন আত্মসমালোচনা করি, কুরআন ও সীরাতের জ্ঞান, আমাদের জীবনে কতটুকু বিদ্যমান আছে। কুরআনে হাকিমের এক একটি আয়াত পড়ুন এবং আত্মসমালোচনা করুন, বাস্তবতার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক আছে কি ?

এমনিভাবে পবিত্র সীরাতে এক একটি ঘটনা পড়ুন এবং চিন্তা করুন, এই ঘটনা এবং নবীয়ে কারীম ﷺ-এর এই সুন্নাতের সাথে আমার ব্যক্তিগত জীবনে কিছু আদান-প্রদান হয়েছে কি? আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি, প্রচলিত বিচক্ষণতার ধুলা দ্বারা চক্ষু ঢেকে যাবে, এবং নিজের বাস্তব অবস্থা সামনে ফুটে উঠবে।

فسوف ترى اذاانكشف الغبار
اتحت رجلك فرس ام حمار

আমাদের অবস্থা হলো এই; শরীয়তের কিছু জিনিস, যা আমাদের পরিবেশে পরিণত হয়েছে, অথবা নবী কারিম ﷺ-এর ওই সুন্নাত যা ছেড়ে দেয়া প্রচলিতভাবে দোষণীয় মনে করা হয়, সে গুলোকে আমরা

পুরো দীন বানিয়ে রেখেছি। পক্ষান্তরে হুকুম হলো, ادخلوا في السلم كافة

অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং

لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন হলো তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ। আমাদের সমস্ত আমল ও কাজ-কর্ম এবং কথাবার্তা সবকিছুর মাপকাঠি হলো, আমার হাবীব ﷺ-এর জীবনী। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সত্য গ্রহণ করার সবচেয়ে বড় বাধা হলো, পৈত্রিকভাবে চলে আসা প্রথাসমূহ। সকল আম্বিয়াদের তাওহিদের দাওয়াতের উত্তরে مالفينا عليه اباءنا অর্থাৎ এটা ওই পদ্ধতি ও পথ যার ওপর আমাদের বাপ দাদাকে পেয়েছি। এর আপত্তি পেশ করা হত। মানুষের এই দুর্বলতার ভিত্তিতে, দীন ইসলামের সংরক্ষণের জন্য কুরআন সুন্নাহকে সত্যের মাপকাঠি ঘোষণা করা হয়েছে। কোনো বড় থেকে বড় অনুসরণীয় ব্যক্তির জীবন যদি কুরআন সুন্নাহ থেকে পৃথক হয়, তাহলে সেটা তার দুর্বলতা মনে করা হবে। যেমন–কোনো বড় বুযুর্গ রাস্তায় চলাকালে যদি কলার ছিলকায় পা পরার কারণে পিছলে পড়ে, তাহলে তার বুযুর্গী ও সম্মানের মধ্যে বিঘ্নতা আসবে না। বরং কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি বড় রাস্তায় ছিলকা ফেলে পদস্খলিত হয়ে বুযুর্গের অনুসরণ করবে না। এমনিভাবে কুরআন সুন্নাহর পথ হলো সীরাতে মুস্তাকিম। এর মধ্যে যদি কম-বেশি করে, তিনি যদি আমাদের কোনো মুরুব্বিও হন, তাহলে সেটা তার সীমাবদ্ধতা মনে করা হবে এবং তার অনুসরণ করা জায়েজ হবে না। আমাদের আনুগত্যের উপযুক্ত হলেন সকল মুরুব্বিগণের মুরব্বি, হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর আদর্শ।

এই প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে যদি একবার কুরআনে হাকিম অধ্যয়ন করি, তাহলে বোঝা যাবে যে, আমাদের জীবনে যে দীন আছে, তা কতটুকু অসম্পূর্ণ। যেমন–আমাদের ওলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে কুরআনের আয়াত সংখ্যা বের করেছেন। কুরআনে কারিমে ৬৬৬৬টি মতান্তরে ৬৬৩২টি আয়াত আছে। এর মধ্যে পাঁচশ থেকে কিছু বেশি আয়াত সমস্ত আহকামের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। যার মধ্যে নামায, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ভালো-মন্দ, উত্তরাধিকার ইত্যাদি আহকাম (আইন-কানুন) রয়েছে। আর কমবেশ ছয় হাজার আয়াত

ঈমানের দাওয়াতের জন্য। অর্থাৎ যেসমস্ত মানুষের কাছে ঈমান পৌঁছেনি, তাদের পর্যন্ত দাওয়াত পৌছানো, অথবা তাদের ঘটনাসমূহ এবং তার সমাপ্তি সাধন জিহাদের ব্যাপারে।

বর্তমানে ইসলামের ওপর অনেক অপবাদ দেয়া হচ্ছে। ইসলামী জঙ্গীবাদের মতো জঘন্য শব্দ আবিস্কার করা হয়েছে। যা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি আতঙ্কের মুল কারণ। জিহাদকে দাওয়াত থেকে পৃথক মনে করা অর্থাৎ জিহাদ যে 'দাওয়াত ইলাল্লাহর' পরিপুরক তা মুজাহিদগণের ভুলে যাওয়া।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী, জিহাদের মূলনীতি একথা বলে যে, জিহাদ হলো দাওয়াতের পরিপুরক। মুজাহিদগণের প্রথম কাজ হলো, তাদের কাছে দাওয়াত পেশ করা। যে , আপনারা ইসলাম গ্রহণ করুন। যদি তা গ্রহণ করে নেন, তবে আপনারা হয়ে যাবেন আমাদের ভাই। যদি তা গ্রহণ না করেন, তাহলে আমাদের কাছে জিম্মি হয়ে যান। আমরা আপনার থেকে বাৎসরিক ট্যাক্স হিসেবে কিছু টাকা নিব; যার বিনিময়ে আপনার নিরাপত্তা ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দিব। আর যদি আপনি দুটো থেকে একটিও গ্রহণ না করেন, তাহলে এবার আপনার কল্যাণের জন্য শক্তির মাধ্যমে দাওয়াতের পথের প্রতিবন্ধকতা দূর করব।

খাইরুল কুরুনের পুরো যুগে যা বিজয়ের অলৌকিক সময়। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার ৫০ বছর পর শতকরা ষাটভাগ অংশে ইসলামের হুকুম বিদ্যমান ছিল। সে যুগে একটি ঘটনাও এমন পাওয়া যাবে না যে, কোনো; সেনাপ্রধান বা আমিরুল মুমিনের পক্ষ থেকে এই নির্দেশনামা পৌঁছেছে যে, আমাদের ঝান্ডার নিচে অনুগত হয়ে চলে এসো, অন্যথায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। ব্যাস! قولولااله الاالله تفلحو... এবং اسلم تَسلَم.. এর ফরমান ছাড়া, সেখানে কোনো ফরমান দেখা যায় না। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, ইসলামী জিহাদ বিভিন্ন দেশে বিজয় এবং কোনো জাতির ওপর হুকুম ও শাসন চাপিয়ে দেয়ার জন্য নয়, বরং তাদেরকে কুফর ও শিরক থেকে বের করে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় দেয়ার এক দরদী প্রচেষ্টা। সেখানে প্রতিটি,সেনাপ্রধান ও সৈনিকদের মাঝে রাসূল ﷺ-এর ওই মূলনীতি বিদ্যমান ছিল, যা রাবি বিন আমের (রা.) রুস্তমের দরবারে

বলেছিলেন। রুস্তম যখন প্রশ্ন করল, সৈন্যদল নিয়ে আমাদের দেশে কেন এলেন? রাবি বিন আমের (রা.) এই মৌলিক সবক শুনিয়ে দিয়েছিলেন,

الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد الى عبادة الله . وحده ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام.... অর্থ: আল্লাহ আমাদেরকে এ জন্যই পাঠিয়েছেন যে, বান্দার দাসত্ব থেকে বের করে এক আল্লাহর দাসত্ব স্বীকার করার জন্য; দুনিয়ার সংকীর্ণতা থেকে প্রশস্ততার দিকে, এবং ধর্মের জুলুম-নির্যাতন থেকে বাঁচিয়ে ইসলামের ন্যায় ও ইনসাফের দিকে বের করে আনার জন্য।

প্রকাশ থাকে যে, এটা সাধারণ আত্মশুদ্ধির জন্য দা'য়ীদের দাওয়াতের সাধারণ জামাত ছিল না, বরং এটা ছিল ইসলামী সৈন্যদলের জিহাদের সফর। এমনিভাবে যে ব্যক্তি বাকি পুরো দীনের ওপর আমল করে যথা:- নামায সুন্নাত অনুযায়ী ও মুস্তাহাব পদ্ধতিতে পড়ে। রোযাও নবীজী ﷺ-এর মতো রাখে। হজ্ব-যাকাতও সেরকমই আদায় করে। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের সকল হক আদায় করে। সবধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। লেবাস-পোশাক, চালচলন, চলাফেরা ও লেনদেন পুরোপুরি সুন্নাত অনুযায়ী করে। কিন্তু দাওয়াত (ঈমান ওয়ালা ও ঈমানা ছাড়া) যার পরিপূর্ণতা হলো জিহাদ। এটাকে জীবনের উদ্দেশ্য বানায়নি; যেমনটি ছিল নবী ﷺ-এর পরিচয়।

যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল ﷺ লিখবে বা বলবে, তখন নবীজী ﷺ-এর প্রতিটি উম্মত এটা চিন্তা করে পড়বে যে, আমার নবী সাইয়েদিনা মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺ-এর নাম নেয়া হচ্ছে। রাসূল ﷺ ছাড়াও বহু নবী এসেছেন। কুরআনে অনেক নবীর নাম এসেছে, এছাড়া বহু নবীর নাম কুরআনে আলোচনা করা হয়নি। একজন ঈমানদারের জন্য সকল নবীর ওপর ঈমান আনা, প্রকৃত ঈমানের জন্য শর্ত। কিন্তু রাসূলুল্লাহ বলা হলে, হযরত মুসা (আ.)-এর কথা মনে করা হয় না। যাকে কুরআনের ২৮ পারায় 'রাসূল' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর কথাও মনে পড়ে না,মুহাম্মদ মুস্তফা ﷺও যার মিল্লাতের। রেসালতের কাজ রাসূল ﷺ-এর এমন এক পরিচয় যে, তাঁর নাম তেমন পরিচিত নয়। যেমন–রাসূলুল্লাহ ﷺ। যে ব্যক্তি পুরো দীনের পর আমল করবে এবং বাহ্যিকভাবে দাওয়াতেরও কাজ করে।

কিন্তু সে দা'য়ী-এ ইসলাম, দা'য়ী-এ দীন হিসেবে পরিচিত করা হয় না। সে কুরআনে মাজিদের ৫৫৩ আয়াতের ওপর আমল করছে এবং ৬১১৩ আয়াতের ওপর আমল ছেড়ে দিচ্ছে।

ইহুদীদের পথভ্রষ্টতা এবং ধৃষ্টতার উপর কুরআনে মাজীদ সতর্ক করেছে,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذٰلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْىٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ * (البقرة-৮৫)

অর্থ: তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা এবং কেয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।

-বাকারা-২: ৮৫

একটু চিন্তা করুন! কুরআনের কিছু আয়াতকে মানা এবং কিছু অমান্য করায় যদি দুনিয়াতে এতো লাঞ্ছনা ও অপমান এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করা হয়, তাহলে ৫৫৩ আয়াত অর্থাৎ শতকরা ৯%ভাগকে মানা আর বাকি ৬১১৩ টি আয়াতকে অমান্য করা ও আমল না করায় কী শাস্তি হতে পারে?

শতকরা ৯ ভাগও যদি হয়, যখন বাকি জীবন সুন্নাত অনুযায়ী হয় এবং ৯ ভাগের ওপরই হিসাব নেয়া হয়। বড় বড় দীনদারদের কাছে কুরআন শরীফ হলো আসল। তিন চার ভাগের ওপর আমল পাওয়া যায়। কারো নামায যদি সুন্নাত অনুযায়ী হয়, তো রোযা হয় সুন্নাতহীন। রোযা হয় তো যাকাত হয় না। ইবাদত ঠিক আছে, তো আখলাক-চরিত্র ঠিক নেই। আখলাক ঠিক থাকলেও লেনদেন তো অধিকাংশেরই সুন্নাত থেকে দূরে। আর মুআশারা হলো ত্রুটিযুক্ত। কেউ পিতা-মাতার হক নষ্ট করে, আবার কেউ স্ত্রীর উপর জুলুম করে। কারো প্রতিবেশী তার উপর অসন্তুষ্ট, আবার কারো আত্মীয়-স্বজন।

এখানে এ কথাটি জেনে রাখা দরকার। দুনিয়াবী নিয়ম অনুযায়ী পরীক্ষার পাশের হার শতকরা তেত্রিশ বা চল্লিশ, তা পেলে পাশ করিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু কুরআন মাজিদ আমাদেরকে এই খবর দেয় যে,

হাসরের মধ্যে পাশ করতে হলে ৫০ এর বেশি পরীক্ষার নম্বর পেতে হবে ।

আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُ . فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُ. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

অর্থ:"তখন যার পাল্লা ভারি হবে, সে তো সন্তুষ্টময় জীবনে থাকবে,আর যার পাল্ল হালকা হবে, তার ঠিকানা হবে এক গভীর গর্তে।"

এমনিভাবে পবিত্র সীরাতকে দেখুন, যার লিখিত রূপ হলো কুরআন হাকিম। কুরআনের সাথে সম্পর্ক, সেটাই তাঁর আমলি ব্যাখ্যা। সীরাতে পাক এক দিকে পড়তে শুরু করুন এবং নিজের জীবনের সাথে মিলিয়ে দেখুন। এই ঘটনার সাথে আমাদের বাস্তব জীবনে কোনো মিল আছে কি? এবার নিজের দীনদার ও সুন্নাতের অনুসারী হওয়ার প্রকৃত অবস্থা আপনার সামনে ফুটে উঠবে। সীরাতে পাকের বিভিন্ন শাখার সাথে নিজের জীবনকে মিলালেই এর বাস্তব নমুনা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে। উদাহারণ স্বরূপ আত্মসমালোচনার একটি পদ্ধতি পেশ করছি।

সকলেরই কমবেশি চিঠিপত্রের প্রয়োজন হয়। আর চিঠি হলো নিজের মনের ভাব প্রকাশের একটি উত্তম মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা যেসব মানুষকে এই যোগ্যতা দান করেছেন, তাদের পত্র গুলো ইতিহাসের পাতায় উজ্জ্বল নক্ষত্র। মুজাদ্দিদে আলফে সানি (রহ:)-এর চিঠি বড় বড় লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। আরো অন্যান্য বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামগণের চিঠিপত্র ইতিহাসে সংরক্ষিত। গালেব এবং আহমদ সিদ্দীকির চিঠির মর্যাদা বিশ্বে প্রসিদ্ধ কিন্তু এ কথা স্বীকৃত যে, অনুসরণের উপযুক্ত শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চিঠিপত্রসমূহ। তিনি যে সমস্ত চিঠিপত্র লিখেছেন, তা ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে। মাকতুবাতে নবী ﷺ-এর নামে বই বাজারে পাওয়া যায়। লেখক সাইয়েদ মাহবুব রেজবী নবী ﷺ-এর এর ২৩২টি চিঠি সংগ্রহ করেছেন।

যার মূলকপি বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এসম্পর্কে ইতিহাসের গ্রন্থে উল্লেখ আছে। যা রাসূল ﷺ অমুসলিমদের উদ্দেশে ঈমানের দাওয়াতের জন্য লিখেছেন। সেই যুগে একটি পত্র লিখা ও পাঠানো কত দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিল। চিঠি লেখার জন্য কাগজ ছিল না। গাছের ছাল

অথবা পশুর চামড়ায় লিখা হত। কালির ব্যবস্থাও তেমন ছিল না। ছিল না ডাক বিভাগের ব্যবস্থা যে, ৫০পয়সার ডাক কার্ড লিখে পোস্ট অফিসে পাঠিয়ে দিবে। পত্রবাহক পাঠানো হতো ও খুব দক্ষ ও উপযুক্ত পত্রবাহক খুঁজতে হত, রাস্তা ছিল না। গাড়ি এবং উড়োজাহাজ ছিল না, উটের উপর সওয়ারীর ব্যবস্থা করতে হত। পত্রবাহকের সাথে একজন রাহবারেরও প্রয়োজন পড়ত। আবার সেই সংকীর্ণতার যুগে এসব কিছুর জন্য রাস্তার সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করতে হত। এছাড়া যে সমস্ত বাদশাহ ও নেতাদের কাছে চিঠিপত্র পাঠাতেন, তাদের ভাষায় চিঠি লেখাতেন। কোনো নির্ভরযোগ্য লেখক পাওয়া যেত না। তাই সাহাবায়ে কেরাম (রা.)কে ভাষা শিখানো হত। এত কষ্টের পরও নবী কারিম ﷺ-এর ২৩২টি চিঠি পাওয়া যায়। যেগুলো অমুসলিম বাদশাহ ও নেতাদের প্রতি ঈমানের দাওয়াত দেয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যেখানে একটি পত্র লিখানো ও পাঠানো অসম্ভব ছিল সেখানে ঈমানের দিকে দাওয়াত দেয়ার বিষয়ে ২৩২টি চিঠি পাওয়া যায়, আর দাওয়াত ছাড়া ১০টি চিঠিও পাওয়া যায় না। এখন যে ব্যক্তি পুরো জীবনে অমুসলিম নেতাদের বা সাধারণ অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার জন্য একটি পত্রও লিখেননি। তিনি কী করে নবী ﷺ-এর অনুসারী ও আদর্শবান হতে পারে?

এমনিভাবে সীরাতে রাসূল ﷺ-এর বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য করুন। রাসূল ﷺ-এর জবান মোবারক থেকে যে সমস্ত কথা বের হয়েছে, সেগুলোও সংরক্ষিত আছে। কতগুলো কথা দাওয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, আর কতগুলো দাওয়াত ছাড়া। এখানেও চিঠি পত্রের মতো কিছু সাদৃশ্য পেশ করা যায় তাহলে দেখা যাবে, কতগুলো দাওয়াতের জন্য লিখা হয়েছে। আর কতগুলো অন্য বিষয়ে।

মোটকথা, রাসূল ﷺ-এর চোখের অশ্রু, হৃদয়জ্বালা ও দুআ-আহাজারি এবং মনের ব্যথা ও দরদের মধ্যে দাওয়াত ও গাইরে দাওয়াতের সাদৃশ্য, সেটাই–যা কুরআন হাকিমে আছে। কুরআনে হাকিমে রাসূল ﷺ-এর দিবা-রাত্রের অন্তর্জ্বালা এমনভাবে উল্লেখ করেছে যা থেকে পবিত্র সীরাতের একটি মুহূর্তও খালি নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ অর্থঃ উহারা মুমিন হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়তো মনের কষ্টে আত্মবিনাশী হইয়া পরিবে। (শুআরা ৩)

শুধু এক স্থানে নয়। আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফের ১২৮ স্থানে রাসূল ﷺ-এর এই ব্যথা, অস্থিরতা ও ব্যাকুলতার কথা উল্লেখ আছেন। যে, মানুষের ঈমানহীন মৃত্যুর চিন্তায়, আপনি দুর্বল হয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমের বহুস্থানে রাসূল ﷺ-এর এই ব্যথা-বেদনা ও অস্থিরতার কথা সংরক্ষণ করে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, নবীজীর যেই ব্যথা-বেদনা ও ব্যাকুলতার কথা তোমাদের শোনাচ্ছি, এটা তোমাদের থেকেও কাম্য।

আপনি কি উম্মতের কোনো ব্যক্তিকে কোনো অমুসলিম এবং কাফের মুশরিককে টার্গেট বানিয়ে তাদের জন্য দুআ করতে দেখেছেন? বিশেষ ব্যক্তিদের দুআয়ও কাউকে চিহ্নিত করে দুআয় এ কথা বলতে শোনা যায় না যে, হে আল্লাহ! আপনি অমুককে হেদায়াত দিন। অমুককে হেদায়াত দিয়ে ইসলামের শক্তি বাড়িয়ে দিন। মদিনার সরদার ﷺ-এর কোনো দুআ এমন হতো না, যেখানে তিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের ব্যথিত হয়ে, আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ না করতেন। বলতেন, হে আল্লাহ! আবুল কাহাফাকে হেদায়াত দিন। হে আল্লাহ! দেশবাসীকে হেদায়াত দিন। হে আল্লাহ! আবু জাহেল এবং উমরের মধ্যে কাউকে হেদায়াত দিয়ে ইসলামের শক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! অমুকের অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দিন। পবিত্র সীরাতের যেকোনো দিক বিশেণ্ঢষণ করা হলে দেখা যাবে যে, দাওয়াত এবং জিহাদ ছাড়া দীনদার ব্যক্তিদের জীবন নবী ﷺ প্রদর্শিত পথে পরিপূর্ণভাবে চলতে পারে না।

পবিত্র সীরাতের কোনো কিতাব অধ্যয়ন করতে শুরু করুন এবং নিজের জীবনের মুহাসাবা করুন। পুরো কিতাব কেন সীরাতের কোনো বইয়ের সূচিপত্রই পড়তে শুরু করুন, এবার দেখুন যে, এই বিষয়গুলোর সাথে আমাদের আমলের কোনো সুযোগ হয়েছে কি না? অথবা এই ঘটনাগুলোর সাথে আমাদের জীবনের কোনো সম্পর্ক আছে কি না?

সীরাতের সাধারণ একজন ছাত্র অথবা বড় ধরনের সীরাতবিদই, নবী আকরাম ﷺ-এর সীরাত মোবারাক-এর যতই সংক্ষিপ্ত সূচি তৈরি করুক না কেন, নিম্নবর্ণিত সূচিগুলো তা থেকে পৃথক করতে পারবে না।

"হেরা গুহায় ওহী অবতরণ, পবিত্র নবুওয়াত প্রাপ্তি, হযরত খাদিজা (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত যায়েদ (রা.), হযরত

আবুবকর (রা.)-এর ইসলামগ্রহণ এবং আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ায় অংশগ্রহণ, ছফা পাহাড়ে প্রথম সত্যের ঘোষণা, শত্রুদের নির্মম নির্যাতন শুরু, মাথা মোবারকের উপর উটের ভূড়ি চাপিয়ে দেয়া, গলা মোবারকে চাদর পেঁচিয়ে ছেঁচরানো, কুরাইশদের হাতে মুসলমানদের নির্যাতন। মুসলমানদের হাবসায় হিজরত এবং কুরাইশদের প্রতিশোধ। হাবসায় ইসলামের দাওয়াত, হযরত উমর (রা.)-এর ইসলামগ্রহণ, কুরাইশদের পক্ষ থেকে শুআবে আবি তালেবে মুসলমানদের সাথে বয়কট, তায়েফে সফর এবং কঠিন নির্যাতনের সম্মুখীন, মেরাজের ঘটনা, আরব গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত, আনসারদের ইসলাম গ্রহণ শুরু, বাইয়াতে উকবায়ে উলা, উকবায়ে সানিয়া, হিজরত, গারে ছাওর, রাস্তায় সারাকার পরিণতি, ইসলামের সর্বপ্রথম দাওয়াতী মারকাজ, মসজিদে কুবার নির্মাণ, মসজিদে নববী, মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন, দাওয়াতের পরিপূর্ণ হুজ্জত পেশ কারার পর দুষ্কৃতিকারীদের সাথে জিহাদের অনুমোদন, আবদুল্লাহ ইবনে যাহশ-এর সারিয়া, বদরের যুদ্ধে প্রকাশ্য বিজয়, বাচ্চাদের শিক্ষার বিনিময়ে মুক্তিপণ, উহুদ যুদ্ধ, হযরত হামযা (রা.), হযরত মাসআব বিন উমায়ের, (রা.) এবং অন্যান্য জানবাজ সাহাবাদের (রা.) শাহাদত। যাতুর রেকার যুদ্ধ, খন্দকের যুদ্ধ, আহযাবের যুদ্ধ, বনী কুরাইযার সাথে যুদ্ধ, বনী মুসতালিকের সাথে যুদ্ধ। ইফকের ঘটনা, হুদাইবিয়ার সন্ধি, বাইয়াতে রেদওয়ান, বিশ্বের রাষ্ট্রপতি ও কাফের নেতাদের প্রতি নবী ﷺ-এর চিঠি। খাইবারের যুদ্ধ, মক্কা বিজয়, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা, হুনায়েনের যুদ্ধ, তাবুকের যুদ্ধ, মদীনায় বিভিন্ন দলপতিদের আগমন, বিদায় হজ্বের শেষ ভাষণে তিনি এই ঘোষণাও দিয়েছেন, এটা উম্মতের সাথে সামগ্রিকভাবে শেষ সাক্ষাৎ। এই মুহূর্তে উম্মতকে শেষ উপদেশ দিয়েছেন। فليبلغ الشاهد الغائب. 'প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো, অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে এই দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেয়া।' মৃত্যু পর্যন্ত উসামার দলের প্রতি রাসূল ﷺ-এর চাহিদা এবং এর প্রস্তুতি ইত্যাদি।

জীবনের বাস্তব কর্ম ক্ষেত্রে এই পুরো সূচির মধ্যে কি কোনো ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে? কখনোও নয়। কারণ হলো এই দাওয়াত ও জিহাদকে আমরা পিছনে রেখে দিয়েছি। রাসূল ﷺ-এর জীবনের

মধ্যে কোনো মুহূর্ত কি لَعَلَّكَ بَٰخِعٌ نَّفۡسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ এর পরিপূর্ণ চিন্তা থেকে খালি দেখা গেছে? আমাদের জীবনে কি কোনো একটি মুহূর্ত এমন কেটেছে যে, এই ব্যথার স্বাদ আস্বাদন করেছি। কোনো কাফের বা মুশরিকের আমানত কি তার কাছে পৌঁছানোর ফিকির করেছি? বণ্টনকারী নবীর উম্মত কি বণ্টনের হক আদায় করতে পেরেছে? কোনো অমুসলিমকে চিরস্থায়ী জাহান্নামের আগুনে পুড়ে ছায় হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচানোর ফিকিরে কিছু সময় কি কেটেছে? একটি মাছির মুখের পরিমাণ অশ্রু আমাদের আঁখিযোগল থেকে কি বের হয়েছে? আমরা কি তায়েফের পাথরের আঘাত খাওয়ার কল্পনা করেছি? স্বপ্নেও কি দাওয়াত দেয়ার জন্য কোনো জনপথে দৃষ্টি বোলানোর সুযোগ হয়েছে? শাহাদতের দুআ কি কখনো করেছি? তাহলে এটা কেমন ঈমান? শওক বাকি রাখার জন্য এবং মাহবুবের সাথে সাক্ষাতের আশায়, প্রেমিকের মতো নিজে তৈরি হওয়া এবং সংশোধন করার চিন্তাও কখনো আসেনি। আমাদের মধ্যে ধার্মিক শ্রেণীর বর্তমান ভাষা বলেঃ لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة(الا الدعوة و الجهاد)

তোমাদের জন্য রাসূল ﷺ-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (দাওয়াত এবং জিহাদ ছাড়া)। (?)

আমার হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (রাহ.) বলতেন, বার বার কুরআন হাকিম তেলাওয়াত করার দ্বারা তার অর্থ ও রহস্যগুলো বোঝে আসে। এখানে

لقدكان لكم في رسول الله اسوةحسنة এ বলেছেন

لقدكان لكم في محمد اسوةحسنة এ বলেননি।

لقدكان لكم في احمد اسوةحسنة এ বলেননি।

لقدكان لكم في رسول الله اسوة حسنة

(নিশ্চয় রাসূল ﷺ হলেন তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।) বলেছেন। কেমন যেন রেছালতের কাজ ছাড়া নেকির ধারণা করাও বেকার।

এটাতো ওই সমস্ত মানুষের অবস্থা, যারা দাওয়াত এবং জিহাদ ছাড়া দীনের অন্যান্য শাখায় নবী করীম ﷺকে পেশ করে। অন্যথায় বাকি শাখাগুলোকে যদি গভীরভাবে দেখা যায়, তাহলে দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া আমাদের জীবন, রাসূল ﷺ-এর আদর্শ থেকে অনেক দূরে।

নবুওয়াতের পূর্বে রাসূল ﷺ-এর জীবন আদর্শ এবং তার কাজকর্ম ও আখলাক-চরিত্র সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন ছিল। কিন্তু তাঁকে যে সমস্ত গুণাবলী মাদউ সম্প্রদায়ের কাছে পরিচয় করানো হতো, তা ছিল সততা ও আমানতদারী। এমনকি নবী ﷺ-এর উপাধি হয়ে গিয়েছিল সাদিকুল আমিন। আমাদের জীবন কি সততা এবং আমানতদারীর পরিচয় বহন করে? আমাদের নামায কি নবী ﷺ-এর নামযের সাথে মিল আছে? নবী আকরাম ﷺ যখন একা নামায পড়তেন, তখন এতো লম্বা নামায হতো যে, পা ফুলে যেতো। আর যখন তিনি ইমাম হতেন একেবারে হালকা এবং সহজভাবে নামায পড়াতেন। আমাদের অবস্থা হলো এর উল্টো, আমরা যখন নামাযে ইমাম হই, তখন কেরাতকে খুব লম্বা করি। আর যখন নিজে নামায আদায় করি, তখন কেরাত হয় খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত। অন্যের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর স্বভাব ছিল সুধারণা করা, অন্যের মালের ব্যাপারে বেশি খোঁজ ও অনুসন্ধান করতেও তিনি নিষেধ করেছেন। তিনি নিজের ব্যাপারে ছিলেন সর্বোচ্চ সতর্ক।

একবার হযরত হাসান (রা.) সদকার একটি খেজুর মুখে দিয়ে ফেলেছিলেন, তৎক্ষণাৎ নবী ﷺ তাঁকে বমি করিয়ে বের করে দিলেন। আমাদের স্বভাব হলো তার উল্টো, অন্যের হালাল মালকেও সন্দেহ বরং হারাম বানানোর চেষ্টা করি। তাতে খুঁজতে থাকি ত্রুটি। নিজের হারাম মালকে হালাল ও পবিত্র হওয়ার দাবি করি।

আমরা কি নবী ﷺ-এর মতো নিজের জন্য বদলা না নেয়া এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের ক্ষমা করা এবং ধর্মের ব্যাপারে সহযোগিতার আচরণ করি? নবী ﷺ-এর লজ্জার কোনো অংশ কি আমাদের জীবনে এসেছে? আমার হত্যার পরিকল্পনাকারীকে হাতের নাগালে পেয়েও, তাকে ক্ষমা করার ধারণা কি আমারা করতে পারি? গালী-গালাজকারী ও পাথর নিক্ষেপকারীর জন্য, কল্যাণের দুআ করা কি আমাদের দ্বারা সম্ভব? একটি রাতও কি আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করে শেষ করার সুযোগ আমাদের হয়েছে? আকিদা-বিশ্বাস, আখলাক, ইবাদাত, এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদের জীবন কি নবী ﷺ-এর আদর্শের সাথে কোনো সাদৃশ্যতা দেখা যায়?

মোটকথা আমরা তো রাসূল ﷺ-এর অনুসারী দাবী করি। কিন্তু আমাদের জীবন ও চাল–চলন সাক্ষ্য দেয় তার উল্টো। এর মূল কারণ

হলো, কুরআন ও সীরাতের সাথে আমাদের সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই; দাবি তো হলো মুমিন। কুরআন সুন্নার অনুসরণের ব্যাপারে একেবারে ভালো মেধাসম্পন্ন হওয়া উচিত। আমাদের ওলামাদের কাছে জানতে হবে যে, এ কাজটির ব্যাপারে আমারদের কী করতে হবে। এবং এ কাজটি আমাদের নবী ﷺ কিভাবে করতেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি এইভাবে আমল করা, এবং জানার অভ্যাস গড়ে তোলা যায়, তাহলে দাওয়াত ও জিহাদের গুরুত্ব, যা ইসলামে দেয়া হয়েছে, তা চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠবে। পবিত্র সীরাত এবং নিজের জীবনের মুহাসাবা করার দ্বারা প্রত্যেক সত্যানুসন্ধানীর সামনে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আমাদের জীবন নবীজীর আদর্শ থেকে কতোটুকু দূরে সরে গিয়েছে। দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া নবীজীর জীবনকে আদর্শ বানানো ঠিক এমন মনে হয় যে, কোনো ব্যাক্তি কোনো জামার নমুনা নিয়ে এসেছে, কিন্তু সেই জামায় হাতা ও আঁচল কিছুই নেই, তাহলে কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কি এটাকে নমুনা হিসেবে গ্রহণ করবে? কখনও নয়। বরং এটাকে নমুনা হিসেবে উপহাস করা হবে। মনে হয় শয়তান এর فزين لهم الشيطان اعما لهم. (শয়তান এই আমলকে সুন্দর বানিয়ে দিয়েছেন।) খবর অনুযায়ী আমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই ধোঁকা।

রাসূল ﷺ সাহাবাদেরকে বলেন যে, যদি তোমরা দ্বীনের দশভাগেরও আমল করা ছেড়ে দাও, তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। এমন এক যুগ আসবে, তারা যদি দ্বীনের দশভাগের ওপরও আমল করে, তাহলে তারা নাজাত পেয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, সরদারের বাণীর সামনে মাথা নত করা, ও স্বীকার করা সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু এই নির্দেশ দ্বারা ১০ভাগের ওপর আমল করার সুযোগ আছে কি? দাওয়াত ও জিহাদকে বাদ দিয়ে দশভাগের ওপর আমল কোথা থেকে বের হবে? আপনি যদি দীনের সকল শাখা থেকে ১০ভাগের ওপর আমল করেন। দাওয়াতের ১০ভাগ এবং জিহাদের ১০ভাগের ওপর আমল করেন। তাহলে মনে হয় আপনি নাজাত পেয়ে যাবেন। দীনের কোনো ফরজকে ফরজ বুঝে, তারপর তা ছেড়ে দেয়াকে গুনাহ মনে করে পুরোজীবন ছেড়ে দেয়া ফাসেকী গুনাহ। কিন্তু দীনের ন্যূনতম কোনো হুকুমকে নির্বাচন করে আমলের অনুপযুক্ত মনে করা তাকে একেবারে ছেড়ে দেয়া দীনের মধ্যে বিকৃতির শামিল। এ জন্য দীনকে তার আসল অবস্থায়

বোঝা ও আমল করার জন্য আবশ্যক হচ্ছে। কুরআনকে সীরাতের সমন্বয়-সাধন করা। এবং কুরআনকে সীরাতের আলোকে আমলকারী সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরামদের জীবনী অধ্যয়ন করা এবং সে অনুযায়ী শতভাগ নিজের জীবনকে পবিত্র সীরাতের ছাঁচে ঢেলে সাজানো, যা দাওয়াত এবং জিহাদ ছাড়া অসম্ভব।

প্রচলিত আংশিক ধর্ম পালন ও কুরআন সুন্নার অধ্যয়নের কথা একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে বুঝে আসবে। কয়েকজন অন্ধ ব্যক্তির হাতি দেখার আগ্রহ জন্মেছে। তারা শহরে গেছে হাতি দেখতে, তাদের তো আর চোখ নেই। তাই তারা সুস্থ এক ব্যক্তিকে বলল, ভাই! আমরা হাতি দেখতে চাই, আমাদেরকে হাতি দেখিয়ে দিন। সে বলল, আচ্ছা! ঠিক আছে, চলো তোমাদেরকে হাতি দেখাচ্ছি, এই বলে তাদেরকে হাতির কাছে নিয়ে গেল এবং একজনের হাত ধরিয়ে দিল হাতির কানে। অপরজনকে হাত ধরিয়ে দিল হাতির পায়ে। আর একজনকে পেট ধরিয়ে দিল। একজনকে হাতির শূর ধরিয়ে দিল। এবার তারা খুশি মনে গ্রামে ফিরল। গ্রামের লোকজন জিজ্ঞাসা করল, তোমরা হাতি কেমন দেখলে? যে হাতির পা ধরেছিল সে উত্তর দিল, হাতি হলো একটি খাম্বার মতো। যে হাতির কান ধরেছিল সে বলল, হাতি হলো, কুলার মতো। যে হাতির শূর ধরে ছিল সে বলল, হাতি তো একটি মোটা সাপের মতো। যে লেজ ধরেছিল সে বলল, তোমরা কেউ হাতি দেখতে পাওনি, হাতি তো হলো 'একটি ঝাটার মতো'। এমনিভাবে প্রত্যেকে তাদের নিজ ধারণা মতো হাতির পরিচয় দিল। এই অংশগুলো ছিল বিশাল এক হাতির একটি অঙ্গ মাত্র। চক্ষুদৃষ্টি না থাকার দরুণ আসল হাতির ওপর কারও হাত পড়েনি।

ইসলাম সম্পর্কে আমাদের অবস্থাও হলো ঠিক অন্ধ ব্যক্তিদের মতো। কুরআন ও সীরাতের নূরের চক্ষু না থাকার দরুণ, অন্ধদের মতো আমারাও দ্বীনের কোনো অংশকে পুরো দীন মনে করে নিয়েছি। এ জন্য প্রয়োজন আমাদের চিন্তা-চেতনাকে বর্তমান যুগ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে চলে যেতে হবে ইসলামের শুরু যুগ এবং নবী যুগের কুরআন সুন্নার খাইরুল কুরুনের পরিবেশের দিকে। এরপর সেই ধাঁচে জীবন গড়ার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া ইসলাম ধর্মের মজা ও তার নিয়ামত অনুধাবন করা হবে অসম্ভব। আমাদের উন্নতির ও সফলতার সিঁড়ি শুধু

খাইরুল কুরুনের মধ্যে দীনকে বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। যেখানে সব আমল ও আহকামসমূহ জীবনের সকল শাখায় অবস্থান দেয়া হয়েছে, যা সাহাবয়ে কেরাম (রা.) দিয়েছিলেন। যা দাওয়াত ও জিহাদ ছাড়া সম্ভব নয়। দাওয়াত ও জিহাদের ব্যাপারে পুরো মূলনীতি ও তার পদ্ধতি কুরআন ও সীরাত থেকে গ্রহণ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো মুসলমানের দাওয়াতী প্রেরণা সৃষ্টি হয়, তাহলে ঈমানের দুর্বলতার কারণে এবং বিভিন্ন মাসলেহাতের বাহানা দিয়ে পুরো জীবনে ঈমানের দাওয়াতের তৌফিক হয় না। এ ব্যাপাওে যদি সীরাতে পাকের পথ-নির্দেশনা নেওয়া হয়, তাহলে লিখিতভাবে মাকতুবাতে নববীর মধ্যে..اسلم تسلم.. (ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পেয়ে যাবে) উপস্থিত আছে। কোনো কোনো চিঠিতে এই শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। আর মৌখিক দাওয়াতে পাওয়া যায়।قولوالااله الاالله تفلحون. লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো, কামিয়াব হয়ে যাবে। যদি এর দ্বারা শত্রুরা রাগ হয় এবং শত্রুতা করে, তাহলে নবী ﷺ-এর আনুগত্বের মাধ্যমে এ পথের উত্তম পাথেয় আর কী হতে পারে?

হায়! আল্লাহ তাআলা যদি আমাদেরকে কুরআন ও সীরাতের এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করার তৌফিক দিতেন এবং উম্মতে মুসলিমার খাইরুল কুরুনকে মাপকাঠি বানিয়ে দীনকে তার আসল নমুনা মানা ও তার ওপর আমল করার রুচি তৈরি করে দিতেন।

আমরা যদি মুমিন হই। আলহামদুলিল্লাহ! অবশ্যই আমরা মুমিন। তাহলে আসুন! আমরা কালেমা শাহাদাত পড়ে, ইখলাসের সাথে আল্লাহর দাসত্ব ও রেসালাত দুটিরই জন্য নবী ﷺ-এর অনুসরণ কারার অঙ্গীকার করি। তারপর আমাদের বিবেককে একটু জিজ্ঞেস করি।

আসুন একটু আত্মসমালোচনা করি

* আমাদের আকিদা-বিশ্বাস কি বিশুদ্ধ তাওহিদের ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে?

* আমাদের ইবাদত নবী ﷺ-এর আদর্শের অনুস্বরণের পরিবর্তে প্রচলিত প্রথার অনুসরণ নয় তো?

*লেনদেনের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ কি নবীজী ﷺ-এর লেনদেনের মতো পরিষ্কার?

* আমাদের আখলাক চরিত্রে কি রাসূল ﷺ-এর অনুসরণ প্রকাশ পায়?

* আমাদের অবয়ব, পোশাক-আশাক, কাজের পন্থা-পদ্ধতি, রুচি-অভিরুচিতে নবীজীর ভালোবাসা ও অনুসরণ প্রকাশ পায় কি?

*আমাদের অস্তিত্ব, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, এলাকাবাসী বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য কি রহমত স্বরূপ?

* আমাদের অন্তরে কি নবীজীর মতো শাহাদাতের প্রেরণা আছে? না মৃত্যুকে অপছন্দ করি?

* আমাদের কি নবীজীর মতো একটি রাতও চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথিক অমুসলিম মানুষদের আগুন থেকে বাঁচাবার জন্য অশ্রু ঝরানোর সুযোগ হয়েছে কি?

* আমাদের ভেতর নবীজীর মতো তায়েফে দাওয়াতের পথে পাথরের আঘাত খেয়েও তাদের জন্য দুআ দেয়ার হিম্মত আছে কি?

* আমরা দাওয়াতের পথে শুআবে আবী তালেব এর মতো, বছর কেন, কয়েকদিনের জন্যও কি বন্দি থাকার কল্পনা করতে পারি?

* নবীজীর মতো দাওয়াতের জন্য নিজের মাতৃভূমি ও আপনজনদের ছেড়ে হিজরতের জন্য কি আমরা প্রস্তুত আছি?

* আমরা কি নবীজীর মতো এক একজন মানুষের কাছে সত্তরবার ধিক্কার পাওয়ার পরও কি দাওয়াত নিয়ে যাওয়ার মতো হিম্মত করতে পারি?

* আমাদের জীবনে কি দাওয়াত এবং জিহাদের ওই মর্যাদা অর্জন হয়েছে, যা নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামদের হয়েছিল?

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর যদি নেতিবাচক হয়, তাহলে কোন মুখ নিয়ে, নবী ﷺ-এর অনুসরণের দাবি করি।

আখেরাতের ভীতি প্রদর্শন

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً

যেদিন জালেম তার হাতকে কেটে কেটে খাবে আর বলবে হায়! আমি যদি রাসূলের সাথে রাস্তা অনুসরণ করতাম। (সুরা আরফুরকান-২৭)

এর থেকে বাঁচার উপায় হলো,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِيٓ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَآ أَنَاْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"আপনি বলেদিন যে, এটা আমার পথ, আমি ডাকি আল্লাহর দিকে প্রকাশ্য প্রমাণাদির দ্বারা। আমি এবং সে যে আমার অনুসরণ করবে।"

নবীজীর অনুসরণ করবো এবং দাওয়াতের পথে জান-মাল বাজি লাগিয়ে দিব।

সমাপ্ত

হিলফুল ফুজুযুল প্রকাশনীর প্রকাশিত কয়েকটি বই

- আলোর পথে সিরিজ-১